

ইতিহাসের ছিন্নপত্র

(ঔপনিবেশিক শাসন থেকে আজাদী আন্দোলন)

কায় কাউস



গাডিঘান

পা ব লি কেশ ন স

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস।

শব্দটা হামেশাই উচ্চারিত হয় মুখে মুখে। ইতিহাস আদতে কী? অতীত ঘটনা ও কার্যাবলির অধ্যয়ন— তাই তো? সেই সংজ্ঞামতে ইতিহাসের পাঠগুলোও এক-একটা ইতিহাস।

অতীতে একটা ঘটনা বারবার ঘটেছে—ইতিহাসের চোখে একটা কাঠের চশমা পরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। আমরা তো জানি, ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গন্ডগোলটা বেধেছে ঠিক এখানেই। স্ব-স্ব চিন্তা-কাঠামোর ইতিহাসবিদরা নিজেদের রঙে রাঙিয়েছেন ইতিহাসকে। যার যত দক্ষতা, ক্ষমতা ও মাধ্যম ছিল, সে তত বেশি ইতিহাসকে দখল করেছে। প্রচলিত একটা নিষ্ঠুর বয়ান আছে—ইতিহাস নাকি বিজয়ীর চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখায়।

দুনিয়ার সবাই স্রোতের দিকে ছুটতে স্বস্তি পায়। কিছু মানুষ থাকে, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে হিম্মত দেখায়। ইতিহাসের ধারাবাহিক স্রোতে অনেক সময় সত্যকে লুকিয়ে ফেলার একটা আয়োজন করা হয়, কিন্তু কিছু মানুষ মাটি ফুঁড়ে সে ইতিহাস দুনিয়াবাসীর সামনে হাজির করার কোশেশ করে। কায় কাউস ঠিক তেমনই একজন ইতিহাসবেত্তা।

‘ইতিহাসের ছিন্নপত্র’ গ্রন্থটি অতীত ইতিহাসেরই পুনর্পাঠ; নতুন ইতিহাসের সৃষ্টিকর্ম নয়। এখানে গ্রন্থকার নিজ থেকে বয়ান তুলে ধরেনি; শ্রেফ ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া মণিমুক্তোগুলোকে সংগ্রহ করেছেন পরম যত্নের সঙ্গে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের পরিশ্রম খুঁজে পাবেন।

‘ইতিহাসের ছিন্নপত্র’ তিন খণ্ডের গ্রন্থ। আপনাদের হাতে প্রথম খণ্ড তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে। সত্যের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসের এই বোঝাপড়া আপনাদের ভাবনার জগৎকে নতুন করে সাজাবে। ইতিহাসের চোখে পরানো কাঠের চশমাটা খুলে সেখানে ‘বাস্তব লেন্স’ লাগিয়ে দেওয়ার আয়োজনে আপনাকে স্বাগত। ছিন্নভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ পাঠকদের ঠিকানায় পোস্ট করা হলো ‘ইতিহাসের ছিন্নপত্র’ গ্রন্থিত চিঠির মাধ্যমে।

সম্মানিত লেখক এবং এই গ্রন্থ প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থের কোথাও কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। ভালো থাকুন সকলে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

৩০ আগস্ট, ২০২০

মুখবন্ধ

“ইতিহাসের ছিন্নপত্র”—সাধারণভাবে অবিভক্ত ভারতের এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোচিত কিংবা আপাত দুর্লভ ইতিহাসের পুনর্পাঠ। স্থান-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারাবাহিক কিংবা পূর্ণাঙ্গ গবেষণা নয়। এ ইতিহাসের সুবিশাল মহীরাহ হতে ঝরে পড়া, ইতস্তত ছড়ানো, কুড়িয়ে পাওয়া কিছু শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি মাত্র।

ইতিহাস বহুমাত্রিক, বহুপাক্ষিক। বিজয়ী আর বিজিত উভয়পক্ষেরই থাকে ঘটনার স্ব স্ব বয়ান। বিজয়ীর ইতিহাস হয়তো ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা পায় আর বিজিতের ইতিহাস মিশে থাকে কালের ধুলোয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কালের ধুলো থেকে ইতিহাসের সেই স্বর্ণরেণু তুলে আনেন ইতিহাসকার। এভাবেই এককালে যা সর্বসম্মত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায়, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের নিরলস অনুসন্ধানে তা ভিত্তিহীন গল্প বলেই প্রতিভাত হয়। আমাদের উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তা আরও বেশি প্রযোজ্য।

আমি ইতিহাসকার নই। ইতিহাসের একনিষ্ঠ, মুগ্ধ পাঠক মাত্র। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, উপাখ্যান, কাহিনি, তথ্য-উপাত্ত কিংবা বর্ণনার মধ্যে থাকে ইতিহাস রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মনোভাবের প্রতিফলন। এভাবে বহু আপাতবিরোধ, অসংগতি, উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি কিংবা স্মৃতিভ্রংশতার সমূহ সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পাঠকেরও নিজস্ব এক উপলব্ধির জগৎ তৈরি হয়। তৈরি হয় তার সত্যানুসন্ধিৎসা আর ব্যাপক পরিসরে জানার আগ্রহ। আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে তেমনই কিছু বিপরীত কিংবা বিস্মৃত বয়ান তুলে এনে সেই অনুসন্ধিৎসাকেই জাগানোর প্রয়াস পেয়েছি। ইতিহাসের যে বিষয়গুলি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু স্বল্পালোচিত বা পাদপ্রদীপের অন্ধকারে লুকোনো মনে হয়েছে তাতেই আমি অধিক মনোনিবেশ করেছি। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি ভিন্ন-মত সম্পর্কে যত বেশি জানা সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা খণ্ডিত ইতিহাসই, পূর্ণাঙ্গ কিছু নয়। আমার প্রচেষ্টাও সে পথেই পরিচালিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের কোথাও আমি নিজস্ব মতামত কিংবা মন্তব্য সংযুক্ত করিনি। যা কিছু উল্লেখ করেছি আদ্যোপান্ত তা সরাসরি তথ্যসূত্রসমেত মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি, তথ্য কিংবা বর্ণনার সন্নিবেশ। একই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছি, গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ কোনো মত প্রকাশের চেষ্টা ব্যতিরেকেই। আশাকরি আগ্রহী পাঠকগণকে তা আরও গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রতিটি লিখিত বইয়ের আড়ালে থাকে কিছু জীবন্ত বই। একটি বই তৈরি হওয়ার পেছনে যারা নীরবে, নিভৃতে, কাছে কিংবা দূর থেকে ছায়ার মতো উপস্থিত থাকেন, অনুপ্রেরণা জোগান, ত্যাগ স্বীকার করেন, পরম মমতা আর ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখেন—তারা। আমার এই সুদীর্ঘ যাত্রায় তাদের সবার অপরিশোধ্য ঋণ গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। বইটি

প্রকাশের দুর্বহ দায়িত্ব নেওয়ায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশনসকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই অন্তর্জালের সকল বন্ধু, সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ীদের যারা সব সময় পাশে থেকেছেন, সমর্থন আর উৎসাহ জুগিয়েছেন। পরিশেষে বিনীতভাবে দায় ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই সংকলনে উদ্ধৃত সকল বইয়ের লেখক, প্রকাশক এবং স্বত্বাধীকারীদের প্রতি।

কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সম্পূর্ণ সংকলনকে কিছু কালপর্বে বিভক্ত করে প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; যার প্রতিটি খণ্ডই হবে স্বতন্ত্র। আশাকরি এতে করে মূল পাঠের রসাস্বাদনে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটবে না। যদি অসাবধানতাবশত কোনো মুদ্রণ প্রমাদ, তথ্যের অসম্পূর্ণতা কিংবা অসংগতি থেকে থাকে তবে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের আশা রাখি।

কায় কাউস

১৬ জুন, ২০২০

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঔপনিবেশিক শাসনকাল

প্রথম পর্ব	
আজাদী আন্দোলন এবং ইংরেজ বর্বরতা	১৩
দ্বিতীয় পর্ব	
ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিম শিক্ষা	২৪
তৃতীয় পর্ব	
কলকাতার বাবুদের ইংরেজি শিক্ষা	৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায় পাকিস্তান আন্দোলন : পটভূমি ও প্রেক্ষিত

প্রথম পর্ব	
অবিভক্ত ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা	৪৯
দ্বিতীয় পর্ব	
আজাদীর স্বপ্ন	২৬৫
তৃতীয় পর্ব	
আজাদী আন্দোলনের দলিলপত্র	২৮৭
চতুর্থ পর্ব	
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাব	৩৩৬
পঞ্চম পর্ব	
স্মৃতিতে সিলেট গণভোট : পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির লড়াই	৩৫৪
ষষ্ঠ পর্ব	
র্যাডক্লিফের ছুরি : বাউন্ডারি কমিশন	৩৮০
সপ্তম পর্ব	
আজাদ ভারত-আজাদ পাকিস্তান	৩৯৪
অষ্টম পর্ব	
কায়দে আজম, দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তান	৩৯৮
নবম পর্ব	
বেহাত আজাদী — ভিন্ন বয়ান	৪৪০

প্রথম পর্ব আজাদী আন্দোলন এবং ইংরেজ বর্বরতা

এক

“...শূন্যপ্রায় শহরে ইংরেজ সৈন্যরা প্রাণভরে লুটপাট করে ফিরতে থাকে। পথিমধ্যে যাকে তারা পেয়েছে সবাইকে তারা হত্যা করেছে। বাদশাহ ও তার পরিবারের সকলকে বন্দি করে শহরের পথে হডসন নামক জনৈক সেনানায়ক বাদশাহর পুত্রগণকে হত্যা করে। বিচারে বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়। তথায় তিনি ১৮৬২ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ সৈন্যরা দিল্লী বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। শহর দখল করার পর সৈন্যরা শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয়নি- সামনে যাকে পেয়েছে - সকলকেই হত্যা করেছে। দিল্লীর কমিশনারের স্ত্রী লিখেছেন-‘...For several days after the assault every native that could be found was killed by the soldiers, women and children were spared.’ কমিশনার সাহেব নিজেই লিখেছেন-‘...The troops were completely disorganised and demoralised by the immense amount of plunder which fell into their hands and the quantity of liquor which they managed to discover in the shops of the European merchants of Delhi.’

লর্ড রবার্টস লিখেছেন-‘...দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে যারা বাস করছিল, তারা সকলেই এখন ইংরেজ পক্ষের শত্রু; সুতরাং তারা বধ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল।’ মার্টিন সাহেব লিখেছেন-‘...সমস্ত বিদ্রোহীই দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা ছাড়া অতি অল্প লোককেই নগরে দেখা যেত। যখন আমাদের সৈন্যরা নগরে প্রবেশ করে তখন যেসব লোককে পাওয়া গিয়েছিল, তাদের সকলকেই সঙ্গীনের ঘায়ে বধ করা হয়েছিল। কোন কোন ঘরে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। এতেই আপনি বুঝতে পারেন নিহত লোকের সংখ্যা কত বেশি। এরা বিদ্রোহী নয়, নগরের অধিবাসী। এদের মনে মনে আশা ছিল যে, এদের ক্ষমা করা হবে। আমি নিঃসন্দেহে জানাচ্ছি যে এদের এ বিষয়ে হতাশ হতে হয়েছিল।’

জনাব ফজলে হক খয়রাবাদী লিখেছেন-‘...রক্ত পিপাসু ইংরেজ সেনা লুণ্ঠন, গণহত্যা এবং নানা অকল্পনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে সমগ্র দেশে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে।’

১৮৫৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিন্দু অধিবাসীদের শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। আরও কয়েকমাস পরে মুসলমানরাও শহরে প্রবেশ করার অনুমতি পায়।

...বেনারসের সিপাইদের অভ্যুত্থানের পর জেনারেল নীল নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের নিয়ে শান্তিবাহিনী গঠন করলেন। এ শান্তিবাহিনীগুলি শান্তি রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে ফিরত আর যাকে দেখতে পেত তাকে হয় গুলি করতো বা ফাঁসির ব্যবস্থা করতো। কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজরা এসব এলাকায় যেসব নারকীয় ঘটনার অবতারণা করে, ইংরেজ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ‘হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান মিউটিনি’ পুস্তকে কে এন্ড ম্যালেসন লিখেছেন- ‘...এ একঘেয়েমিকে ভাঙবার জন্য তারা সোজাসুজি না ঝুলিয়ে দেহগুলিকে ভেঙ্গে চুরে বিকৃত করে, কোনটাকে ইংরেজী অঙ্ক চার-এর মত, কোনটাকে বা সাত-এর মত করে নিয়ে তারপর ঝোলাত।’

শুধু ফাঁসিই নয়, গ্রামে গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দিত। গ্রামের লোক পুড়ে মরত। এ খবর তারা রসিয়ে রসিয়ে বন্ধু বান্ধবদের কাছে লিখে জানাত। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মৌলভী, স্কুলের ছাত্র, অন্ধ, খোঁড়া সবাই এ অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে পুড়ে মরত। চলৎশক্তিহীন স্থবির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আগুন দেখেও এক পা সরতে পারত না, জ্বলন্ত বিছানায় ছটফট করে মরত। কোন লোক যদি অগ্নিবেষ্টনী ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতো তবে তাকে গুলি করে মারা হত। জনৈক ইংরেজ অফিসার এ সম্পর্কে তার ইংরেজ বন্ধুকে লিখেছেন-‘...আমরা জনপূর্ণ বড়ো একটি গ্রামে আগুন লাগিয়ে চারিদিক ঘেরাও করে রইলাম। আগুনের মুখ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেকেই ছুটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালাম।’

বিদ্রোহীদের দ্রুত শান্তি বিধানের জন্য সামরিক আদালত বসান হয়েছিল। বিচারকরা ছোট, বড়ো সমস্ত অপরাধীকেই ফাঁসির হুকুম চালাতেন।

...জনৈক ব্রিটিশ অফিসার তাদের এলাহাবাদের সাফল্য সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হল :

‘...আমাদের এবারকার যাত্রা অদ্ভুত রকম উপভোগ্য হয়েছে। আমরা নদীপথে স্টিমারে চলেছি, আর শিখ ও ফুসিলিয়ার বাহিনীর সৈন্যরা হেঁটে শহরের দিকে চলেছে। আমাদের সাথে একটা কামান রয়েছে। ডানে বায়ে দুদিকে কামান দাগাতে দাগাতে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর স্টিমার আর চললো না। আমরা নেমে হেঁটে চললাম। আমার সাথে ছিল আমার

পুরান দোনালা বন্দুকটা। তাই দিয়ে বেশ কয়েকটা নিগারকে ধরাশায়ী করলাম। প্রতিহিংসায় আমি তখন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি।

আমরা যে পথ দিয়ে যাই দুদিকে আগুন লাগিয়ে যাই। অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করে আর বাতাসের বেগে হু হু করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতদিনে বিশ্বাস ঘাতক শয়তানগুলোর প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে। আমরা প্রতিদিন এ অভিযানে বের হই, বিক্ষুব্ধ গ্রামগুলিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেই। আমরা আমাদের প্রতিহিংসা পূরণ করে চলেছি। নেটিভদের বিচারের জন্য যে কমিশন বসান হয়েছে, আমাকে তার নেতা হিসাবে মনোনীত করেছে। এদের সবার আয়ু আমাদের হাতেই ঝুলছে। একথা তুমি স্থিরভাবে জেনে নিও, আমরা কাউকে রেহাই দিই না। পথের দুধারে গ্রাম গুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, কোথাও জন প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যে গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে চলেছি, তার চেয়ে শূন্যতার ছবি আর কল্পনা করা যায় না। পথের দুধারে পচা জলাভূমি, পুড়ে যাওয়া কুড়েগুলির কালো কালো ধ্বংসাবশেষ, তার উপর ছাতা পড়েছে। মানুষের অস্তিত্বের পরিচায়ক এতটুকু শব্দও শোনা যায় না। শব্দের মধ্যে শুধু ব্যাঙের ডাক, শেয়ালের তীক্ষ্ণ চীৎকার আর অদৃশ্য সহস্র সহস্র পতঙ্গের একটানা মৃদু গুঞ্জন। নিম ফুলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ডালে গলিত মৃত দেহগুলি ঝুলছে, শূরোরগুলো তাই নিয়ে মহোৎসবে মেতে উঠেছে, তারই উৎকট দুর্গন্ধ বাতাসের সাথে ভেসে আসছে। এ সমস্ত মিলে আমাদের মধ্যে যে শূন্যতা, কালিমা ও বেদনার ছবি রচনা করে তুলেছে, আমার মনে হয়, যারা সেদিন সেখানে ছিল জীবনে কোনদিন তারা তা ভুলতে পারবে না।’

...ঝাঁসি দখলের পর ইংরেজ সৈন্যরা এক সপ্তাহ কাল ব্যাপী এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি লুণ্ঠন করে বেড়ায়। মাত্র ৭৫ জন ইংরেজ প্রাণহানীর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা ঝাঁসীর পাঁচ হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরিব্রাজক বিষ্ণু ভট্ট গোডসে এ সময় ঝাঁসীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি লিখেছেন—‘...সমস্ত শহর প্রেতভূমি ও মহাশ্মশান বলে বোধ হল। জ্বলন্ত বাড়িগুলি থেকে লেলিহান অগ্নি শিখা উর্ধ্বে উঠে রাত্রির আকাশকে ভয়াল করে তুলল। আগুন ও বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে আর্ত নরনারীর ক্রন্দনের রোল উঠল। প্রিয়জনের মৃতদেহের পাশে বসে রমণী কাঁদছেন আর তার সামনে বেয়নেট ঠুকে গোরা সিপাই অলংকার খুলে দিতে বলছে। ধনী দরিদ্র সবার শিশু সন্তানই এক সাথে এক মুষ্টি অন্ন চেয়ে কাতর কণ্ঠে কেঁদে ফিরছে। কোথাও বালকপুত্রের মৃতদেহ নিয়ে মা শোকে বিহ্বল। কোথাও পিতার দেহের পাশে বসে শিশু সন্তান ছোটো ছোটো হাতে পিতাকে আঘাত করে ডাকছে। হালোয়াইপুরার জ্বলন্ত অট্টালিকার কাঠের বরগাগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে উড়ছে ছাই আর গলিত শবদেহের তীব্র দুর্গন্ধ।’

প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার লো লিখেছেন—‘...মৃত্যু ফিরতে লাগল ঘর থেকে ঘরে উল্কাগতিতে। একটি মানুষকেও রেহাই দেওয়া হল না। রাস্তাগুলিতে রক্ত স্রোত বইতে শুরু করলো।’

হিউরোজ নিজেই লিখেছেন—‘...প্রাসাদ অধিকৃত হবার পর থেকে বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। নগর অবরোধের সাফল্য এই একটি কথাতেই বোঝা যায় যে, একজনকেও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। নগরীর আশে পাশের বন, বাগান, রাস্তা বিদ্রোহীদের শবদেহে পরিপূর্ণ হল। বিদ্রোহী সৈন্যরা সাধারণত: জাতিতে পাঠান ও আফগান।’

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য লিখেছেন—‘...বাঁসী শহরের রাণীর সমস্ত সৈন্য এবং বহুলাংশে নাগরিকরা নিহত হল। সমস্ত নগরীর পথে কদমাক্ত রক্ত জমে রইল। শকুনী উড়তে লাগল সমৃদ্ধ নগরীর আকাশে। হিউরোজের কঠিন নিষেধ ছিল ভারতীয়েরা যেন কোনমতেই যেন তাদের শবদেহের সৎকার করতে না পারে। সাতই এপ্রিলের পর সমস্ত নগরী যখন পুঁতিগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, গলিত শবদেহের লোভে শৃগাল ও শকুনী বিচরণ করতে লাগল তখন হিউরোজ আদেশ দিলেন, এবার শবদেহের সৎকার করা যেতে পারে।’

...৫১ নং বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রি থেকে বারজন সিপাই দলত্যাগ করে পালিয়েছিল। তাদের ধরে এনে প্যারেডের ময়দানে সবার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়। ৫৫ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে এক ‘শ’ পঞ্চাশজন নিকলসন বন্দি করে নিয়ে আসেন তাদের মধ্যে ৪০ জনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ১০ই জুন তাদেরকে কামানের সামনে বেঁধে রেখে ফায়ার করা হয়।

পলাতক চার ‘শ’ জন সিপাই সোয়াতে কিছুদিন অবস্থান করার পর কাশ্মীরের দিকে যাত্রা করে। কাশ্মীরের রাজা গোলাপ সিং ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহীদেরকে ধরিয়ে দেয়। সবাই ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়তে লাগল। মিলিটারী আদালতের বিচারে তারা সবাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল। মেজর বেচার উল্লসিত হয়ে লিখেছেন—‘...এভাবে ৫৫ নং রেজিমেন্টের শেষ লোকটি পর্যন্ত বন্য পশুর মত আমাদের জালে ধরা পড়ল। এরই মধ্যে দিয়ে আমরা বিদ্রোহী রেজিমেন্টেগুলোর কাছে হিতকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। তাদের কাছে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি কি সুদূর প্রসারী আমাদের শক্তি। সীমান্তের ওপারে গিয়েও অব্যাহতি নেই, সেখানে গেলেও আশ্রয় মিলবে না।’

...সিপাইরা প্রাণভয়ে ইরাবতী নদীর দিকে ছুটে চলেছে। পেছনে তাড়া করছেন অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপার। তার সাথে সত্তর আশি জন সওয়ার। বিদ্রোহী সিপাইরা নদী তীরে এসেই বড়ই মুসকিলে পড়ল। নদীতে নৌকা নেই। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে উজনালা থেকে তহশিলদার সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করল। এই আক্রমণে কমপক্ষে দেড়শ সিপাই শহীদ হলো। অসহায় সিপাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল ইরাবতীর তীর। সংগে সংগে কুপারও নদী তীরে এসে উপস্থিত হলেন। এর পরের ঘটনা ফ্রেডারিক কুপার তার লিখিত ‘ক্রাইসিস ইন দি পাঞ্জাব’ পুস্তকে যা লিখেছেন তা হলো :

‘...সিপাইদের মধ্যে অনেকেই নদীতে ডুবে যায়। নদীর মাঝামাঝি ছোটো একটা দ্বীপ ছিল। অনেকে কাঠের টুকরোর উপর ভর করে ভেসে সেই দ্বীপের দিকে যেতে থাকে। এরা সবাই অনাহারে অবসন্ন এবং পথশ্রমে ক্লান্ত। তার উপর হঠাৎ আমরা যখন আক্রমণ করলাম তখন সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিল। বুনো পাখীগুলি যেমন নদীর মধ্যে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে, এরাও সে রকম চেষ্টা করতে লাগল। ওদের ধরে আনবার জন্য দুখানা নৌকা পাঠালাম। বিশ মিনিটের মধ্যে নৌকা দুখানা সে দ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। ভয়ে আর নিরাশায় কোন পথ খুঁজে না পেয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ জন সিপাই আবার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের ধরবার জন্য যে সব সৈন্য গিয়েছিল তারা ওদের মাথার দিকে তাক করে গুলি করতে উদ্যত হলো। আমি যখন তাদের গুলি করতে নিষেধ করলাম, তখন পলাতক সিপাইরা ভাবল ডেপুটি কমিশনার বোধ করি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবেন। এ কথা মনে করে তারা সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। হাত বাঁধার সময় তারা বাধা দিল না। তারা মনে করেছিল সামরিক আদালতে তাদের যথারীতি বিচার হবে এবং বিচারের আগে অন্তত একবার তাদের পেট ভরে খেতে দেওয়া হবে।

রাত দুপুরের সময় দুশো বিরশিজন বন্দি সিপাইকে উজনালাল থানায় নিয়ে আসা হলো। পরদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল বলে এদের মেরে ফেলার কাজটা স্থগিত রাখতে হয়।

১লা আগস্ট দিন ধার্য হলো। আমি সিপাইদের বাঁধার জন্য বেশি করে দড়ি সংগ্রহ করে আনতে বলে দিয়েছিলাম। শিখ সৈন্যরা দড়ি নিয়ে এল। প্রতিবারে দশ জনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গুলি করে মারাই স্থির হলো।

প্রতিবারে দশ জন করে দড়ি দিয়ে বাঁধা সিপাইকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হতে লাগল। শিখ সৈন্যরা গুলি করার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট থানায় বসে সবকিছু তদারক করছিলেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাইরা এদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ও শিখ সৈন্যদের গালি দিতে লাগল। প্রতিবারে দশজন করে সিপাই প্রাণ দিতে লাগল।

দুশো সাইত্রিশ জন সিপাইকে এভাবে মারা হলে একজন কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে এসে জানাল যে, অবশিষ্ট সিপাইরা প্রাচীরের ভিতরকার ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। সংবাদ পেয়ে আমি নিজেই সেখানে গেলাম। ঘরের দুয়ার যখন খোলা হলো তখন দেখা গেল ভয়ে, শ্রান্তিতে, অবসন্নতায়, অতিরিক্ত গরমে এবং আংশিকভাবে শ্বাসরোধের ফলে ঐ ঘরের পয়তাল্লিশ জন সিপাই প্রাণ ত্যাগ করেছে। স্থানীয় মূর্দাফরাসদের নিয়ে লাশ গুলি বের করা হল। থানার কাছে একটা গভীর কুয়া ছিল। নিহত সিপাইদের লাশগুলি উক্ত কুয়ায় ফেলে দেওয়া হল।’

চীফ কমিশনার কুপারের কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল তাকে প্রশংসা জানালেন। প্রধান বিচারপতি রবার্ট মন্টোগোমারী সাহেব প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে

উঠেছিলেন। অপর পক্ষে মার্টিন সাহেব প্রশ্ন তুলেছিলেন, ‘এদের ধ্বংস সাধন করা হল কোন আইনে?’

...ঢাকার লালবাগের খন্ডযুদ্ধে যে সব সিপাই বন্দি হয়েছিল, সে সব পলাতক ক্রমে ক্রমে ধরা পড়তে লাগল। বন্দিদের সবাইকে আন্টাঘরের ময়দানে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) গাছের ডালে ডালে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দিনের পর দিন মৃত দেহগুলি ঝুলতে লাগল। পচে গলে পড়তে লাগল। শকুনেরা মহোৎসবে মেতে গেল।

হৃদয়নাথ মজুমদার ‘দি রেমিনিসেন্স অব ঢাকা’ পুস্তকে লিখেছেন—‘...তাদের সব কয়জনকে ফাঁসিতে ঝোলান হল। আন্টাঘরের ময়দানে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে ঢাকার লোক এই জায়গাটাকে ভয়ের চোখে দেখতো। বাংলা বাজার, শাঁখারী বাজার, কলতা বাজার এবং চারিদিককার অন্যান্য মহল্লার লোকদের মধ্যে এ নিয়ে নানারকম গল্প প্রচলিত ছিল। রাত্রিবেলা নিহত লোকদের প্রেতাত্মারা নাকি ময়দানে ঘুরে বেড়াত এবং সেখান থেকে নাকি আর্তনাদ ও নানারকম বিকট শব্দ শোনা যেত। বুড়োবুড়িদের কাছে আমরা এই সকল গল্প শুনতাম। সন্ধ্যার পর ভয়ে ওদিকে মাড়াতাম না।’^১

দুই

‘...ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ধ্বংসের একটা যথার্থ দাবী অনুযায়ী ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সাধিত হয় গোলযোগের আকারে। এ সম্পর্কে মি: লেকীর উক্তি :

“বিশ্বের কোন বিদ্রোহকে যদি সত্য্যশ্রয়ী বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে তা ছিল হিন্দুস্তানের হিন্দু মুসলমানদের বিদ্রোহ।”

লর্ড রবার্টস ভারতে ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এর নামে মি: এনসেব-এর পত্রের শেষ একটি বাক্যের উল্লেখ করেছেন : ‘আমার মতে এসব কার্তুজ ব্যবহার করে সিপাহীদের ধর্মীয় অনুভূতিকে অসহনীয় পন্থায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।’

কিন্তু এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, সভ্যতা-ভদ্রতার দাবীদাররা এ বিদ্রোহের সাথে কেমন আচরণ করেছে, কিভাবে তা দমন করেছে, ধর্মীয় উন্মাদের পরিভাষার জন্য সেসব বিচক্ষণ জ্ঞানীদের কর্মপন্থা কি ছিল, যারা জনসেবার নামে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইউরোপ থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিল।

^১. আবু জাফর/স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। [লেখক - সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। পৃ. ১৯১-২১৫]

‘যখন শুনবে বুকে পাটা বাঁধবে, খোদা না শুনাক কারো শোক গাঁথা।’ (মূল উর্দু থেকে অনূদিত)

কার্তুজের বিরুদ্ধাচরণের জন্য যে মানবতা বিধ্বংসী দণ্ড দেওয়া হয়েছিল জনৈক ইংরেজ তার চিত্র এঁকেছেন এভাবে :

‘...বন্দুক এবং সংগীনের পাহারায় ৮৫ জন জওয়ানকে সামরিক পোশাকে সিপাহীর বেশে সামরিক আদালতের সামনে হাযির করা হয়। উচ্চস্বরে তাদেরকে দণ্ড শোনানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সিপাহীদেরকে জঘন্য অপরাধীদের ফিরিস্তিতে শামিল করা। তাদের কাছ থেকে সামরিক প্রতীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পেছন থেকে টেনে তাদের উর্দি ছিঁড়ে ফেলা হয়। তারপর লৌহকার কড়া আর শিকল নিয়ে এগিয়ে আসে। চক্ষের পলকে সে ৮৫ জন জওয়ানকে তাদের সংগী সাথীদের বিশাল সমাবেশে নিতান্ত অপমানের সকল বাহ্য নিদর্শনসহ অর্থাৎ হাতে হাতকড়া আর পায়ে শিকল পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়।

এটা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং লজ্জাস্কর দৃশ্য। এতে সিপাহীরা যারপরনাই দুঃখিত হয়। বিশেষ করে তারা যখন তাদের হতভাগ্য সঙ্গীদেরকে এহেন অসহনীয় এবং হতাশ অবস্থায় দেখে, তখন তাদের দুঃখের কোন সীমা ছিল না। অথচ তাদের অনেকেই ছিল নিজ নিজ পল্টনে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বহুবার তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বৃটিশ সরকারের প্রতি প্রভু ভক্তির প্রমাণ পেশ করেছে। কয়েদীরা হাত তুলে অনুনয় বিনয় করে উচ্চস্বরে জেনারেলের নিকট করুণা ভিক্ষা করে এবং এ কঠিন বিপদ ধ্বংস থেকে মুক্তি চায়। এভাবে আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে না জেনে তারা সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করে নীরবে এই জিল্লতি স্বীকার করে নেয়ার জন্য তাদেরকে তিরস্কার করে এবং তাদের মর্যাদাবোধ জাগ্রত করে। তখন সেখানে এমন একজন সিপাহীও বর্তমান ছিল না যে এ দৃশ্য অবলোকন করে অন্তরে ব্যাথা অনুভব করেনি। কিন্তু তোপ-বন্দুক এবং সওয়ারদের চক চক করা খঞ্জনের মুখে হামলা করার কথা কেউ ভাবতে পারেনি। অবশেষে বন্দিদেরকে তাদের স্ব স্ব কুঠরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের পাহারায় নিয়োজিত করা হয়েছিল তাদেরই বন্ধুদেরকে।’

১৮৫৭ সালের গোলযোগের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত জালিমরা তাদের জুলুমের কথা স্বীকারই করেনি। আর মজলুমরাও এতটা ধ্বংস ও বিপন্ন ছিল যে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নীরবতা পালন করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু জালিমদের নিত্য দিনকার নতুন নতুন জুলুম, অন্তরে চাপা পড়া স্কুলিঙ্গকে চাপা করে তুলছিল। আর তা কত দিন চাপা থাকতেই বা পারে? তারা ভারতবাসীর অন্তরকে ভেতর থেকে দাহ করে চলছিল। তখন কিছু ইংরেজ অনুভব করে যে, তাদেরকে হিন্দুস্তানীদের বন্ধু সেজে এসব স্কুলিঙ্গ নির্বাপনের চেষ্টা চালাতে হবে। চাপা পড়া স্কুলিঙ্গ যাতে বৃটেনের রাজ সিংহাসনের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিণত না হয়, এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ মতবাদ অনুযায়ী Edward John Thompson ষাট বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর

অপরাধ স্বীকার করে আধুনিক কূটনীতির মাধ্যমে এসব স্কুলিঙ্গ নির্বাপনের চেষ্টা চালান। তিনি The Other Side of the Medal নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেন।

ফাঁসি : ইংরেজদের দৃষ্টিতে ফাঁসির শাস্তির গুরুত্ব নেই। আর এ দণ্ড পাওয়ার জন্য সত্যি সত্যি বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার মি: কুপার লিখেন :

‘...পাঞ্জাবের লোকজন সাধারণত: বৃটিশের অনুগত ছিল। সেখানে মি: মন্টেগোমারীর নির্দেশে শিখ পল্টনের একজন সুবেদার, অস্থারোহী পুলিশের একজন রিসালদার এবং কারাগারের একজন দারোগাকে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে ফাঁসির কাঠে ঝুলানো জরুরী বিবেচনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যাতে ভালভাবে একথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, পাঞ্জাবের শাসকবর্গ শুরু থেকেই অবিরত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনমনে প্রভাব বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেছে। এই একটি মাত্র উপায়ে এ আধা পশুর দেশে সম্মম বজায় রাখা যায়। অপর দিকে এই কঠোর নীতির লক্ষ্য এটা প্রকাশ করা যে, সরকার জনগণের কাছে নিঃশর্ত এবং দ্ব্যর্থহীন বিশ্বস্ততা দাবী করে, তবে তা প্রজাদের ধৈর্যের উপর ভরসা করে নেয়। কেননা এটা হবে অনেকাংশে সরকারের দৃঢ়তার পরাজয়ের সমার্থক।’

মি: কুপার আমাদেরকে বলেন—‘...বন্দিদের স্থায়ী মুক্তির পথ ছিল অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ দেখা মাত্রই নিকলসনের ধ্বনি দেওয়া হতো - ফাঁসির কাঠে নিয়ে চলো।’

জনৈক পাদ্রীর একজন বিধবা স্ত্রী বিজয়ীনির ভাষায় লিখেছেন :

‘...অনেক বিদ্রোহীকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা গীর্জার ফরাশ পরিষ্কার করবে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এ ধরনের কাজ করা তারা পসন্দ না করলেও সঙ্গীনের জোরে তাদেরকে এ তুচ্ছ কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই অতি ফূর্তির সাথে এ কাজ করে। তারা করেছিল এ ধারণায় যে, হয়তো এতে করে ফাঁসির দণ্ড থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা সফল হয়নি, বরং তাদের সকলকেই ফাঁসির কাঠে ঝুলানো হয়েছে।’

মাজিডী লিখেছেন :

‘...জামি মসজিদের উপর পাহারা দিয়ে আরামসে রাত কাটাই। আমাদের বেশিরভাগ সময় কাটতো বন্দিদেরকে গুলি করে হত্যা করা বা ফাঁসিতে ঝুলানোর কাজে। এসব বন্দিদেরকে আমরা ভোরে গ্রেফতার করি। এদের মধ্যে অনেক হতভাগার জীবনতো গ্রেফতারের স্থলেই শেষ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তাদের চেহারা বীরত্ব ও সংযমের ছাপ ছিল স্পষ্ট। আর তা ছিল এর চেয়েও বড়ো কোন উদ্দেশ্যের স্পষ্ট নিদর্শন।’

২৬ নং পল্টনের অপরাধ এবং তাদের দণ্ড সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে টাইমস পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় :

‘...বিদ্রোহ ঘোষণার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পাঁচশ লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়। প্রশ্ন জাগে, এদের কী অপরাধ ছিল? অথচ স্বয়ং দায়িত্বশীল শাসক শ্রেণীর রিপোর্ট থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত বিদ্রোহীরা ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। কেবল ঝাড়ের ভয়েই তারা পালিয়েছিল। এ ছাড়াও অবরোধকালে ক্ষুধা, পথের দূরত্বের কষ্ট এবং শোকে-দুঃখে তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল আধমরা মানুষের মতো।’

যাহোক, এত বিপুল সংখ্যক হিন্দুস্তানীকে ফাঁসি দেওয়া হয় যা বর্ণনার অতীত। (এলাহাবাদ থেকে কানপুরে আসার পথে) রাস্তার পাশে ৪২ জনকে ২ দিনে ফাঁসি দেওয়া হয়। আর ১২ জনকে কেবল এ অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয় যে, সৈন্যরা যখন মার্চ করে তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল।

যেখানে সৈন্যরা ঘাঁটি স্থাপন করে, তার আশপাশের গ্রামসমূহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এসব ছিল কানপুরের জুলুমের ঘটনার জবাব এমন বলা ঠিক নয়, কারণ, কানপুরের শয়তানী ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এ ভয়ঙ্কর ঘটনার অনেক পরে।

পার্লামেন্টের সংরক্ষিত রেকর্ড পত্রে অদ্যাবধি ভারত সরকারের কাছে সেসব কাগজপত্র সংরক্ষিত রয়েছে। যা থেকে জানা যায় যে, বিদ্রোহ ছাড়াও সাধারণ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধদেরকেও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিল।

দিল্লীতে রক্তপাত অভ্যস্ত সিপাহীরা তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা প্রশমিত করার জন্য ফাঁসি দাতা জল্লাদদেরকে ঘুষ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে তারা ফাঁসির কাষ্ঠে অপরাধীদেরকে আরো বেশি সময় ঝুলিয়ে রাখে। যাতে করে লাশের ছটফট করার হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করে (তাদের ভাষায় নর্তক বলা হয়) নিজেদের রক্ত পিপাসু মনকে আরো তৃপ্ত ও তুষ্ট করতে পারে। ঝাঝরের নবাব সাহেবের প্রাণ বের হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি : কানপুরের ঘটনার পূর্বেই বেনারস এবং এলাহাবাদে একটা উপলক্ষ্যে কয়েকজন শিশুকে কেবল এজন্যই ফাঁসি দেওয়া হয় যে, তারা কৌতুক করে বিদ্রোহের পতাকা নিয়ে বাজারে সমাবেশ করেছিল। মৃত্যুদণ্ড দানকারী আদালতের একজন অফিসার চক্ষুবুজে কমান্ডিং অফিসারের নিকট গমন করে এসব নাবালক শিশুদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের ফাঁসির দণ্ড মওকুফ করার আবেদন জানান। কিন্তু তাদের সে আবেদনে কোন কাজ হয়নি।

এ প্রসঙ্গে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যাবে, যেখানে এ ধরনের লোক দেখানো আদালতেও প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। বরং নিরাপরাধ লোকদেরকে অকাতরে হত্যা করা হয়। ফাঁসি দেয়ার

জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের দল গঠন করা হয়। এসন স্বেচ্ছাসেবীর দল তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গ্রাম গঞ্জে সফর করে। অথচ তখন তাদের কাছে ফাঁসি দানের সমস্ত উপকরণ ছিল না এবং ফাঁসি কিভাবে দিতে হয় তাও তাদের ভালভাবে জানা ছিল না। তাদের মধ্যে একজন শরীফ লোক তার গৌরবজনক সাফল্য গর্বের সাথে প্রচার করে বলে, ‘আমরা ফাঁসি দেয়ার সময় সাধারণত: আম গাছ এবং হাতী ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাতির পিঠে বসিয়ে গাছের নিচে যেতাম এবং উপর থেকে রশি টাঙ্গিয়ে হাতীকে তাড়াতাম। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছটফট করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় ইংরেজী চ এর মতো রূপ ধারণ করতো।’

লক্ষ্যে অধিকার করার পর হত্যা ও লুটতরাজ চালানো হয়। যে কোন হিন্দুস্তানীকেই নির্বিচারে হত্যা করা হয় - তা সে সিপাই হোক অথবা অযোধ্যার পাড়া গাঁয়ের অধিবাসী হোক। এমনকি তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও বোধ করা হয়নি। কেবল কালো রং হওয়াকেই অপরাধী হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ হিসাবে ধরে নেওয়া হত এবং সে ব্যক্তিকে বধ করার জন্য একটি রশি ও একটি গাছের ডালকেই যথেষ্ট মনে করা হত।

শূল : দিল্লীসহ অন্যান্য স্থানে শহরের উঁচু জায়গায় চতুর্থকোন শূল স্থাপন করা হয়। সেখানে প্রতিদিন পাঁচ ছয়জনকে চড়ানো হতো এবং ইংরেজ অফিসাররা প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট পুড়িয়ে ঐসব লাশের দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধ হতেন।

জ্বলন্ত শলাকা দিয়ে দাগানো বা পুড়িয়ে মারা : মি: নিকলসন, মি: এডওয়ার্ডসকে লেখা এক পত্রে বলেন :

‘.. দিল্লিতে ইংরেজ নারী ও শিশু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এমন আইন পাশ করতে হবে, যে আইন অনুযায়ী আমরা তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে পারি, জীবন্ত অবস্থায় তাদের চামড়া তুলে ফেলতে পারি কিংবা জ্বলন্ত শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে তাদেরকে শেষ করতে পারি। এমন জালিমদেরকে কেবল ফাঁসি দিয়ে ধ্বংস করার ধারণা আমাকে পাগল করে তুলে। আমার আন্তরিক কামনা হচ্ছে এই যে, আমি যদি বিশ্বের এমন কোন অখ্যাত প্রান্তে চলে যেতে পারতাম, যেখানে কঠোর থেকে কঠোরতর প্রতিশোধ গ্রহণ করে মনের ঝাল মেটাবার পূর্ণ অধিকার আমার থাকে।’

নিকলসনকে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে খুব একটা অপেক্ষা করতে হয়নি। মি: মুয়েরী অমসন কোন কোন বন্দিদের করুণ ইতিহাস স্যার হেনরী কটনকে শুনিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায় :

‘...সন্ধ্যায় একজন শিখ আদালী আমার তাঁবুতে এসে সালাম জানিয়ে বলে, বন্দিদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে তা দেখতে হয়তো আপনি পছন্দ করবেন। আমি তখনই লাফ দিয়ে কয়েদীদের ক্যাম্পে প্রবেশ করি। সেখানে হতভাগ্য মুসলমানদেরকে অত্যন্ত বেহাল অবস্থায়

দেখতে পাই। পিঠে মশক বাঁধা রয়েছে এবং তারা উলঙ্গ মাটির উপর পড়ে আছে। তামা পুড়ে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা দেহ দাগানো হয়েছে। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে আমার নিজের পিস্তল দ্বারা তাদের জীবনের অবসান ঘটানোকে আমি তাদের জন্য সমীচীন মনে করি।’

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা : হতভাগা কয়েদীর জ্বলন্ত দেহ থেকে পঁচা দুর্গন্ধ বের হয়ে আশে পাশের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য গর্ব করা হতো, তখনই এই ভয়ানক দৃশ্য দেখা যেত যে, মানুষকে পাশবিক পন্থায় জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে আর শিখ ও ইউরোপীয়রা অতি শান্ত-শিষ্টভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য অবলোকন করছে, যেন এটা কোন চিত্র বিনোদনের বিষয়বস্তু আর কি।

টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা মি: রাসেলও এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন :

‘...কিছুদিন পর আমি ঐ ব্যক্তির জ্বলন্ত হাড় ময়দানে পড়ে থাকতে দেখেছি।’

এডওয়ার্ড টমসন লিখেন : ‘...মস্তিষ্কের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া পড়ে বিধায় কখনো কখনো মানুষ নবাব মঈনুদ্দীন হাসানের ঐ বর্ণনা, যাতে ভারতীয় হৃদয় বিদারক শাস্তির উল্লেখ রয়েছে, পড়তে বা শুনতেও প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সরকারি কাগজ পত্রে এখনো এমন সব দলীল দস্তাবেজ সংরক্ষিত রয়েছে, যা দেখে জানা যায় যে, ইংরেজরা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এসব শাস্তি প্রয়োগ করতো। একজন ইংরেজ অফিসারের চিঠি এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। যাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে, ঐ মর্মবিদারী শাস্তি ধারার নিন্দা করে বলা হয়েছে, আর কতকাল মানব জাতিকে এভাবে নির্মম পন্থায় গরম শলাকায় ছুটফুট করতে ও ভাজি হতে দেখার কষ্ট বরদাস্ত করতে হবে।’

শুকরের খালে সেলাই করে পোড়ানো : টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক মি: ডি সেন লিখেছেন :

‘...জীবন্ত মুসলমানকে শুকরের খালে জড়িয়ে সেলাই করা, ফাঁসির পূর্বে তাদের দেহে শুকরের চর্বি মাখিয়ে তাদেরকে জীবন্ত আগুনে ফেলা বা তাদেরকে একে অন্যের সাথে কুকর্ম করতে বাধ্য করা - দুনিয়ার কোন সভ্যতাই এমন ঘৃণ্য ও প্রতিশোধমূলক আচরণের অনুমতি দেয় না। লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এসব আচরণ খৃস্টানদের নামে এক কলঙ্কময় কাণ্ড। একদিন আমাদেরকেও এগুলোর কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।’

কামানে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া : লর্ড রবার্টস তার মায়ের কাছে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন :

‘...আমি পায়ে হেঁটে পেশোয়ার থেকে বিলাম পর্যন্ত সফর করেছি। পথে কিছু কাজও হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের নিকট থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া এবং তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলানো। কামানে বেঁধে উড়িয়ে দেয়ার যে পন্থা আমরা অবলম্বন করেছি, লোকদের উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েছে। অর্থাৎ মানুষের মনে আমাদের ভীতি সঞ্চারিত হয়েছে, যদিও শাস্তির এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত হৃদয় বিদারক।

যুদ্ধ অবসানের পর অনেক বন্দিকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। তারা এ ধরনের মৃত্যুর তেমন কোন পরোয়া করে না একথা জানার পর তাদের চার জনকে সামরিক আদালতের নির্দেশে কামানের সাথে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হয়। একদিন একটা তোপের বিকট শব্দে আমরা চমকে উঠি। এর সঙ্গে একটা অবর্ণনীয় ক্ষীণ ও ভয়ানক চিৎকারের শব্দও শুনা যায়। জিজ্ঞাসা করলে জনৈক অফিসার আমাদের জানান, এটা ছিল অতি মর্মবিদারী দৃশ্য। অর্থাৎ ঘটনা চক্রে একটি কামানে বেশি বারুদ ভরা হয়েছিল।

কামান চালালে হতভাগ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির মাংশ টুকরা টুকরা হয়ে আকাশে উড়ে যায় এবং দর্শকদের উপর রক্তের ছিঁটা এবং গোস্টের টুকরা পতিত হয়। আর তার মাথা জনৈক পথচারীর উপর এমন সজোরে পড়ে যে, সেও তাতে আহত হয়।’

ক্ষুধার্ত রেখে বা গলা টিপে হত্যা করা : মি: কুপার লিখেন :

‘...প্রথম আগস্ট ছিল বকরে ঈদের দিন। এ কারণে মুসলিম সওয়ারদেরকে সেখান থেকে পৃথক করার জন্য একটা ভালো ওজর পাওয়া যায়। তদানুযায়ী তাদেরকে উৎসব পালন করার জন্য অমৃতসর প্রেরণ করা হয়। কেবল একজন খৃস্টান অফিসার সেখানে একা থেকে যায় নানা রকম কুরবানী করার জন্য বিশ্বস্ত শিখদের সহযোগিতায়। উক্ত অফিসার নিশ্চিত মনে নিজের কাজ করছিলেন। এখন মুসলিম দাঁড়িয়েছে এই যে, লাশের দুর্গন্ধ যাতে ছড়াতে না পারে, সেজন্য তা পুঁতে ফেলা দরকার, কিন্তু তা কিভাবে করা হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে নিকটেই একটা বিরান কূপ পাওয়া যায়। দশ জনের এক একটি দলকে গুলি করে মারার পর যখন নিহত সিপাহীর সংখ্যা একশ পঞ্চাশে দাঁড়ায়, তখন হত্যাকারীদের মধ্যে একজন ঘুরে পড়ে যায়। হত্যাকারীদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে বৃদ্ধ সিপাহী। এ কারণে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাকে সামান্য বিরতি দেওয়া হয়। অতঃপর পুনরায় হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। যখন দুশো সাঁইত্রিশে দাঁড়ায় তখন একজন অফিসার জানান যে, অন্যান্য বিদ্রোহীরা বুর্জ থেকে থেকে বাইরে আসতে অস্বীকার করেছে। কয়েক ঘণ্টা আগে তাদেরকে সামরিকভাবে এ বুর্জে আটক রাখা হয়। কিন্তু বুর্জের দরজা খুললে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এ থেকে হলওয়েল ব্ল্যাক হোলের স্মৃতি ভেসে আসে। অর্থাৎ ৪৫ জনের মৃত দেহ পাওয়া যায় - ভয়, ভীতি, গরম, সফরের কষ্ট এবং দম বন্ধ হয়ে ছটফট করে তাদের মৃত্যু হয়েছে। এসব মৃত বা অর্ধ-মৃত লাশগুলো গ্রামের ডোমদের দ্বারা নিকটস্থ বিরান কূপে ফেলে দেওয়া হয়।’

মজার ব্যাপার এই যে, জেনারেল লরেন্স এবং রবার্ট মন্টেগোমারী এ কাজের জন্য কুপারকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখেন। (তাসভীর কা দোসরা রুখ দ্রঃ)

গণহত্যা ও জনপদে অগ্নি সংযোগ : ৩১শে জানুয়ারী ১৮৫৭ সালে গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের এজলাসের পক্ষ থেকে হিন্দুস্তানে এই মর্মে নির্দেশ জারী করা হয় যে, অনির্ধারিতভাবে গ্রামে অগ্নি সংযোগ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করতে হবে। আর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন নিরস্ত্র লোকদেরকে সেনাবাহিনীর পলাতক সিপাহী মনে করে কখনো শাস্তি না দেন। অনেক সিভিল আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের ইখতিয়ার ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এসবের অপব্যবহার করা হচ্ছিলো।

মেজর রিনাড যখন কানপুরের আটকে পরা লোকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছিল, তখন জেনারেল নেইল-এর পক্ষ থেকে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় :

‘...অপরাধমূলক আচরনের দায়ে সমূলে বিনাশ করার নিমিত্তে কোন কোন গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সব গ্রামের সকল পুরুষ অধিবাসীকে হত্যা করতে হবে। বিদ্রোহী রেজিমেন্টের যেসব সিপাহী নিজেদের চালচলন সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, তাদেরকে অবিলম্বে ফাঁসির কাণ্ডে ঝুলাতে হবে। ফতেহপুর কসবার গোটা জনপদকে ঘেরাও করে হত্যা করতে হবে। বিদ্রোহীদের সকল গোয়েন্দাকে তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দিতে হবে এবং তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সবচেয়ে বড়ো ইমারতের উপর ঝুলিয়ে রাখতে হবে।’

মি: রাসেল তার এক দীর্ঘ বিবরণীতে বলেন :

‘...বিদ্রোহীরা আশ্রয় নিয়েছিল কেবল এ অপরাধে গোটা জেলা ধ্বংস করা মানবতা ও ইনসাফের পরিপন্থী।’

পেনের ওয়ালপুল লিখেছেন :

‘...দিল্লী বিজয়ের পর দুর্ধর্ষ ইংরেজ সৈন্যরা যে লুটতরাজ চালায়, তা দুর্ধর্ষ নাদির শাহের লুট তরাজকেও হার মানায়। প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসির ঘর বানানো হয় এবং দৈনিক ৫/৬ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।’

ওয়ালপুলের বর্ণনামতে তিন হাজার লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ২৯ জন ছিল শাহী পরিবারের। কায়সারুত তাওয়ারীখের রচয়িতা লিখেছেন যে, ২৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। সেখানে একাধারে সাত দিন পর্যন্ত গণহত্যা অব্যাহত ছিল।

...শেষ কয়েক ছত্র ছাড়া যে সমস্ত ঘটনা আপনি পাঠ করলেন, তা গৃহীত হয়েছে ‘১৮৫৭ সালের বিপ্লব : তাসভীর কা দোসরা রুখ’ থেকে অর্থাৎ Edward John Thompson-এর গ্রন্থ The Other

Side of the Medal থেকে তা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখক দাবী করেন যে, ‘...এ গ্রন্থে যেসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা একটিও কোন হিন্দুস্তানীর কলম বা মুখ নিঃসৃত নয়। এংলো ইন্ডিয়ান পত্র-পত্রিকা বা তার চেয়েও নিম্নমানের, আমাদের দেশের পত্র পত্রিকার কোন উক্তিই আমি খুব সামান্যই উদ্ধৃত করেছি। উপরন্তু এমন অনেক ঘটনার কথা আমি উল্লেখই করিনি, যা থেকে আরো কঠোরতা পাষণ্ড হৃদয়তা প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে আপনাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, লর্ড রবার্টসের মতে এ ধরনের সকল পাশবিকতার উদ্দেশ্য ছিল :

‘...এ বদমাশ মুসলমানদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহর ইচ্ছায় কেবল ইংরেজরাই হিন্দুস্তান শাসন করবে।’

এ বর্বরতা, নৃশংসতা ও পাশবিকতার পরিণতি ইংরেজদের জন্য অত্যন্ত শুভ হয়েছিল। মুসলমানরা এতটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে বিসমিল্লাহর পর এ বাক্যটি লেখা থাকত - রাজনীতির সাথে এ প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক থাকবে না।”^২

^২. সূত্র : উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (মূল : উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাঝি/মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ)/অনু : মাওলানা মাযহারুল হক ও মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। [ইসলামিক ফাউন্ডেশন - আগস্ট, ২০০৪। পৃ. ৪৭২-৪৮৬]